সোদপুরে সুভাষচন্দ্র-গান্ধী বৈঠক, সম্পর্ক ও আই. এন. এ সংগ্রাম এর কথা

ড: শেখর শেঠ

ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বা আই. এন. এ. -র অবদান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। নেতাজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তি। আই. এন. এ. -র বিচারের সময় দিল্লীর লালকেল্লায় নেতাজীর দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, **সাহসিকতা, স্বার্থহীন নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতাব** এক অতুলনীয় কাহিনী **উন্মোচিত** হয়েছে। এখনো এর অনেক কাহিনী আমাদের অজানা এবং মানুষের আগ্রহের বিষয়। এই আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রেক্ষাপট ও

এক বিস্মৃত আই. এন. এ- সংগ্রামীর কিছু অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই দুটি বিষয়ে কাকতালীয়ভাবে সোদপুর পানিহাটির কথাও চলে আসে।

আই. এন. এ. —এর প্রেক্ষাপট: আই. এন. এ. -এর বীজভূমি সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান: সুভাষচন্দ্র বসু দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন (১৯২১-১৯৩৯), দুইবার কংগ্রেস সভাপতি হন। ১৯৩৮ -এ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি দেশকে সাবধান করে বলেন—" I have no doubt that British will seek some constitutional device for partitioning India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people." স্বাধীনতা কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না। স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হয়। আমরা আন্দোলনের চাপে যদি আমাদের মুক্তি অর্জন করতে পারি, তবে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার ব্রিটিশ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে পারব। এর জন্য চাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক আন্দোলন। অনুনয় করে পাওয়া স্বাধীনতা নয়। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এতে মহাত্মা গান্ধী ও তার অনুগামী কংগ্রেসীরা রুষ্ট হয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ান (১৯৩৮) ও মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী পট্টাভি সিতারামাইয়াকে পরাজিত করেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গ ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগিতার ফলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে কংগ্রেস নেতৃত্বকে বোঝাতে ব্যর্থ হন সার্বিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা। এক অচলাবস্থা তৈরি হয়। এই অচলাবস্থা মেটানোর জন্য সুভাষচন্দ্র বারে বারে গান্ধীজীকে অনুরোধ করেন। তারই সূত্র ধরে গান্ধীজী তাঁর দ্বিতীয় আবাস গৃহ সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে ২৭ শে এপ্রিল ১৯৩৯ কস্তুরবা গান্ধী সহ এসে ওঠেন। সারা ভারতের দৃষ্টি তখন ছিল এই বৈঠকের ফলাফলের দিকে। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে ২৭-২৮ এপ্রিল এই দুই দিন মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ সময় বারে বারে বৈঠক হয়েছে। পুনরায় ২৯ এপ্রিল শনিবার সকালে ১১.৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার শেষে বেরিয়ে আসার পরে সাংবাদিকরা সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরেন। আলোচনার ফলাফল জানতে আগ্রহী সাংবাদিকদের সুভাষচন্দ্র বলেন "এই খামে সেই উত্তর রয়েছে"। সেখান থেকে জওহরলাল নেহেরুকে সঙ্গে করে সোদপুর ত্যাগ করলেন। ঐদিন বিকেল ৪টের সভাতে ওয়েলিংটনে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন-১৯৩৯ সালে ২৯ শে এপ্রিল।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান

সেই সময়ে গান্ধীজী কংগ্রেস ও ভারতের অবিসংবাদিত নেতা। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কনিষ্ঠতম সভাপতি-এক বিরল সম্মানে ভূষিত। সব তুচ্ছ করে কিসের শক্তিতে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কত আত্মবিশ্বাস! কংগ্রেস ত্যাগের এই সিদ্ধান্ত যেন দেশ মাতার জন্য এক বৃহত্তর ও মহত্তর সংগ্রামের আহ্বান। সুভাষ চন্দ্রের জীবন স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী রামকৃষ্ণের এক অনুপম আদর্শে চালিত। সেই স্কুল জীবন থেকে স্বামীজীর প্রভাব তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী, এ এক অনন্য জীবন ধারা। তিনি আই. এন. এ সংগ্রামে সিঙ্গাপুরে থাকার সময়েও স্থানীয় শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে রাতের অন্ধকারে বারে বারে ছুটে যেতেন এক অমোঘ আকর্ষণে। গেরুয়া বসনে নগ্নগাত্রে শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের সামনে ধ্যানে বসতেন। এছাড়া তাঁর সঙ্গে সর্বদা থাকত একটি পকেট এডিশন গীতা, একজোড়া বাড়তি পড়বার চশমা, আর একটি রুদ্রাক্ষর জপমালা। দেশ মাতৃকার এক অদ্বিতীয় আশিস যেন তাঁর উপর সব সময় বর্ষিত হচ্ছে।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের শেষ সাংবাদিক সম্মেলন

সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে। তাই এই পদত্যাগ যেমন একদিকে আপাত দৃষ্টিতে বেদনাময়, অপরদিকে এটাও সত্যি যে এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক দিক পরিবর্তনের সূচনা এবং তাঁর দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। এই পদত্যাগ তাঁর স্বাধীনভাবে কর্মধারা পালনে সহায়ক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে আই. এন. এ-র সর্বাধিনায়ক হয়ে ওঠেন। এক ভারতের স্বপ্ন নিয়ে আই. এন. এ—এর বীজবপনের ক্ষেত্র হিসাবে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষ্য বহন করে। এটি এক মহতী সিদ্ধান্ত, যার জন্য জীবনধারা ও স্থান-কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পানিহাটির ভূমি, শ্রী চৈতন্য ও শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পদস্পর্শে রঞ্জিত। শ্রী রামকৃষ্ণ পানিহাটিকে আখ্যা দিয়েছেন "মহাতীর্থ"। বারে বারে এসেছেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২৭-এ খাদি প্রতিষ্ঠানের কলাশালার উদ্বোধনের দিন শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন " This place has been sanctified by the feet of Chaitanya"। সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হবার বীজভূমি হিসাবে তাই যেন পানিহাটির সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল, দুর্ভাগ্য সেই খাদি প্রতিষ্ঠান এখন বিস্মৃতির অন্ধকারে।

গান্ধী সুভাষ সম্পর্ক : সুভাষের কংগ্রেস থেকে বিচ্ছেদ সত্ত্বেও কিন্তু ব্যক্তি সম্পর্ক কেমন ছিল? দীর্ঘ ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সুভাষ কংগ্রেসে ছিলেন। দু'জনের যদিও ভাবনার ধরন অন্য ছিল, পদ্ধতিগত তফাৎ, কিন্তু একে অপরের প্রতি নিশ্চিত ভাবেই শ্রদ্ধার ভাব ছিল। মহাত্মা গান্ধী সমস্ত পরিস্থিতিতেই অহিংস মতবাদ এবং সত্যের ব্যাপারে অটল থেকেছেন। গান্ধী যেমন সুভাষকে 'প্রিন্স অ্যামং দ্য পেট্রিয়টস' আখ্যা দিয়েছিলেন, আবার সুভাষও মহাত্মাকে 'ফাদার অফ দ্য নেশন' বলেছেন। সুভাষচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল। আজাদ হিন্দের পরে গান্ধীজি বলেছিলেন, আমরা সবাই আই. এন. এ-র দ্বারা সম্মোহিত। তিনি আরও বলেন, তাঁর অন্তরাত্মা তাঁকে জানান দিচ্ছে, যে নেতাজি জীবিত রয়েছেন এবং উনি ঠিক সময়ই উপস্থিত হবেন। কারণ তিনি স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না! আর আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছেন—"যদিও তাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নি, তবু ওরা যা করেছে, তার জন্য তাদের গর্ব করাই উচিত"। তারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের ঐক্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটা তাদের মহান অবদান।

আই এন এ -এর সেনা পরিদর্শনে নেতাজী

নেতাজী ও গান্ধীজীর সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নেতাজীর স্টেনো ভাস্করণ লিখেছেন, নেতাজী তখন রেঙ্গুনে, "১৯৪৪ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী, রাত তখন সাড়ে দশটা। আমি নিজের ঘরে কতকগুলো জরুরী চিঠি টাইপ করছি, হঠাৎ নেতাজীর টেবিল বয় কালী এসে বললে, স্যার শিগগির ও ঘরে যান। নেতাজী যেন কেমন করছেন। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠি আমি, কেমন করছেন মানে?

—বোধ হয় কোনো খারাপ খবর এসেছে। উনি....মনে হল উনি কাঁদছেন।

—কাঁদছেন?

প্রচণ্ডতম দু:সংবাদ তাঁকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে দেখেছি। তাছাড়া কোনো দুঃসংবাদ এলে আমি তা নিশ্চয় জানতে পারতাম। সমস্ত চিঠিপত্র আমার হাত দিয়েই যায়। গোপনতম সামরিক ও অসামরিক চিঠিপত্র। কই, আমি তো জানি না তেমন কোনো মর্ম-বিদারক দুঃসংবাদের কথা। তখনই কালির পিছু পিছু আমি চলে যাই ওঁর ঘরে। পরদার বাইরে থেকে বলি—ভিতরে আসব স্যার?

—এস।

সন্তর্পণে পরদা সরিয়ে ঢুকে দেখি উনি চুপ করে বসে আছেন একটি সোফায়। দুহাতে মুখ ঢেকে। পাশেই কাঠের টিপয়ে একটা কফির কাপ। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সর পড়েছে কফির উপর। টেবিলের উপর একটি ছোট্ট শর্টওয়েভ রেডিও সেট। আমার ঢুকতে দেখে মুখটা তুললেন-বেদনায় আর্ত সে মুখ।

—কোনো খারাপ খবর পেয়েছেন না কী স্যার?

—হ্যাঁ ভাসি। মা আজ মারা গেছেন!

স্তম্ভিত হয়ে যাই! মা? নেতাজীর মা? তিনি তো বহুদিন স্বর্গগতা। তাহলে? দেশবন্ধু দাসের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীকে উনি মা-জননী বলতেন। তবে কি তিনিই? —বাপ আর ছেলে যখন ঝগড়া করে তখন সবচেয়ে মুশকিল হয় গৃহকর্ত্রীর। একদিকে স্বামী একদিকে সন্তান! কাকে ত্যাগ করবেন তিনি?

এ নিছক স্বগতোক্তি। আমাকে বলছেন না উনি।

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পান। বুঝতে পারেন আমি এখনো বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। রেডিওটার দিকে নির্দেশ করে বলেন—কস্তুরবাঈ গান্ধী আজ মারা গেছেন! ব্রিটিশের কারাগারে!

কী বলব ভেবে পাই না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। উনিও নির্বাক। কত কথা মনে পড়ছে ওঁর। মনে পড়ছে আমার। গান্ধীজীর কথা, কস্তুরবাঈ-এর কথা।"

তিনি কারাগারে আটক অবস্থায় মারা যান। নেতাজি তাঁকে শহীদ এবং ভারতীয় মানুষের মা হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

আমাদের সাধারণ ধারণা নেতাজী ও গান্ধীজী হ'ল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যারা একে অপরের বিরুদ্ধে। নেতাজিকে নায়ক হিসাবে বর্ণনা করার সময় অনেকে গান্ধীকে খলনায়ক হিসাবে চিত্রিত করেছেন। আবার কেউ কেউ নেতাজিকে ফ্যাসিবাদী বলে অভিহিত করেছেন। তারা আমাদের যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মূল্যবোধগুলি শিখিয়েছেন তা উপলব্ধি না করেই তাদের তুলনা করে এবং তাদের অবদানের জন্য লড়াই করে চলেছি। দুই মহান পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কে এই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দিকটি কি অস্বীকার করা যায়? তাই সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে এই দিকটিও তুলে ধরা দরকার।

১৯৪৪ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বারা জারি করা 'ভারতীয় জনগণের জননীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি'।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলির কিছু অংশ।

" Shrimati Kasturba Gandhi is dead...I pay my humble tribute to the memory of that great lady who was a mother to the Indian people, and I wish to express my deepest sympathy for Gandhiji in his bereavement. I had the privilege of coming into frequent personal contact with Shrimati Kasturba, and I would sum up my tribute to her in a few words. She was the ideal of Indian womanhood–strong, patient, silent, self-sufficient.

Kasturba was a source of inspiration to the millions of Indian's daughters.....The British probably hoped that by subjecting Mahatma Gandhi to such mental anguish they could crush him body and soul and beat him into surrender...... They have not understood Mahatma Gandhi. They have not understood the Indian people..

No amount of mental torture and physical suffering that the British can and may inflict on Mahatma Gandhi or the Indian nation will make him budge an inch from the stand he has taken. Mahatma Gandhi called upon the British to quit India and save India from the horrors of modern war "।

আজাদ হিন্দ বাহিনী: ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সিঙ্গাপুরের পতনের কিছু পরেই প্রথম আইএনএ গঠিত হয়। এরপরের বছরেই রাসবিহারী বসু-র আহ্বানে সুভাষ চন্দ্র জার্মানীর থেকে বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রপথে ডুবোজাহাজে পাড়ি দিয়ে টোকিও চলে আসেন। এরপর সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর ভার। এরপর এক নূতন উদ্যোমে ও উদ্দীপনায় ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয় এই বাহিনী। সুভাষচন্দ্রের "আর্জ-ই-হুকুমত" -এ আজাদ হিন্দ (স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার)-এর সেনাবাহিনী ঘোষিত হয়। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইম্ফল ও আরকান-এ আইএনএ জাপানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় এই দ্বিতীয় আইএনএ ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালায়। পরে ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশ অভিযান চলাকালীন পর্যাপ্ত রসদ ও অস্ত্রের যোগান এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের ও হিরোসিমাতে পরমাণু বোমার আঘাতে বিপর্যস্ত জাপানের পতনের কারণে তারা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। যুদ্ধের শেষে বাহিনীর একটি বৃহত্তর অংশকে যুদ্ধ বন্দী করে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের বিচারও হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জীবন উৎসর্গ করে সংগ্রামে ব্যাপ্ত, নেতাজী বারে বারে বার্তা দিচ্ছেন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে সহায়তা ও সহমর্মিতার জন্যে। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন নেতাজী ও ফৌজের সৈনিকদের 'দিকভ্রান্ত' বলছেন, বিরোধিতা করেছেন আর বামপন্থী কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদী শক্তির দোসর বলে প্রচার করেছেন। ইংরাজ সরকারও নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর জনসাধারণের কাছে পৌছতে দেয় নি। যখন লাল কেল্লায় বিচার শুরু হয়ে গেল, বিভিন্ন নথি, ঘটনা প্রবাহ সামনে আসতে লাগলো সারা দেশে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের গৌরব কাহিনীর উদ্দীপনায় আবহ পাল্টে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ -এর সেনা ও বন্দীদের দেশপ্রেমিক রূপে দেখা শুরু হল। নেতাজীর অতুলনীয় সাহস, বীরত্ব, নেতৃত্ব, মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব ত্যাগীর পরিচয়ে নেতাজী অনুপস্থিত থেকেও এক কিংবদন্তী রূপে সকলকে ম্লান করে দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

বিচারের সময় দেশে শোনা যায়, যে আজাদ হিন্দের বীরদের ছাড়া না হলে, তুলকালাম ঘটে যাবে, এমনকী পাল্টা খুন পর্যন্ত। লাহোরে তো এমনও শোনা গিয়েছিল যে, 'আজাদ হিন্দ ফওজ ছোড় দো, লাল কিল্লা তোড় দো'। দিকে দিকে আন্দোলন ও সভা মিছিল হয়। দক্ষিন কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো জনসভাটি আয়োজন করে তারা। কয়েক লক্ষ লোক এই সমাবেশে যোগ দেন।

'জয় হিন্দ' ও 'দিল্লি চলো'-র স্লোগান তখন সারা দেশে। পরের বছর ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলকাতা শহরে ভয়ের চোটে এমনকী ভারতীয়রাও তাদের টাই, হ্যাট লুকিয়ে রাখে। শহরে তিন দিন ধরে যান চলাচল এবং পানীয় জলের পরিষেবাও ব্যাহত হয়। শেষে বাইরে থেকে বাহিনী এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। একজন ব্রিটিশ সৈনিক মারা যান, ১৮৮ জন আহত হন এবং সব মিলিয়ে ৩২ জন আন্দোলনকারী শহিদ হন।

ভাইসরয়ের কাছে এক সরকারি আধিকারিকের লেখা চিঠিতে এই পরিস্থিতিকে ১৮৫৭ -র সিপাহী বিদ্রোহ এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সারারণ মানুষের আবেগ, রাগ, ক্ষোভ যে আকার ধারণ করেছিল, তার চেহারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও অদৃশ্যপূর্ব। আজাদ হিন্দের বিচারের প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে বোম্বাইয়ের ম্যাজাগন ডক। শুরু হয় নৌবিদ্রোহ। জব্বলপুরেও একটি বিদ্রোহ হয়। সমুদ্রের সেই ক্ষোভ আছড়ে পড়ে কলকাতায়, সারা দেশে। ব্রিটিশ সরকার বুঝে যায়, তাদের দিন ফুরিয়েছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সেনাদের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে প্রবল গণবিক্ষোভ ও গণ-উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল তার ফলে ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে প্রবল ভীতির সঞ্চার হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ ম্যাসন বলেছেন, 'এই ঐতিহাসিক বিচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়'।

ডা: বি. কে. নন্দী সামরিক বাহিনীতে (মাঝখানে)

দিল্লীর লাল কেল্লায় যে বিচার কাহিনী ঐতিহাসিক মর্যাদা ভূষিত, সেই কাহিনীতে তিন জন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা নায়কের নাম সকলের কাছে পরিচিত- শাহনওয়াজ খান, গুরবক্স সিং ধীলন ও প্রেম সেহগল। এই তিনজন বীর সেনানীর সঙ্গে দিল্লীর লালকেল্লায় বন্দী ছিলেন এক বাঙ্গালী তরুণ ডাক্তার বি. কে. নন্দী। তিনি তার অপ্রকাশিত স্মৃতি কথায় নেতাজী ও আই এন এ সংগ্রামের এক অজানা ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন। তিনি মুক্তি পাবার পর পানিহাটির বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ-এ ডাক্তার হিসাবে চাকরির সূত্রে আসেন। তাঁর বাড়ি ছিল হুগলীতে, কিন্তু ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে আই এন এ বিচার ও মুক্তির পরে পানিহাটিতে এসে এইখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হন। তিনি নেতাজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন বহুবার এবং কিছু আলোচনাতেও নেতাজী তাঁর মতামত গ্রহণের জন্য তাঁকে ডেকেছিলেন। নেতাজীকে তাঁর নিজের হাতের বানানো রসগোল্লা খাওয়ানোর সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে তিনি বাড়ি থেকে যাত্রা করেন তখন তার বয়স ২৫ বছর, ক্রমে সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মায় আরাকান ফ্রন্টে আই এন এ-এর হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আই এন এ-র মহারথীরা-মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জী, কর্ণেল বুরহানুদ্দীন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্নেল রাথুরী, কর্নেল ধীলন, সাহনওয়াজ খান প্রমুখের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। যুদ্ধের পরাজয়ের পরে তিনি বন্দি হন বর্মার প্রোমে। সেইখান থেকে জাহাজে করে তাঁকে নিয়ে আসা হয় চিটাগঙ্গে, সেখান থেকে প্লেনে করে যশোরে জিগড়গাছায় ক্যাম্পে কিছু দিন রাখা হয়। এরপরে তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে আসা হয় এবং হাওড়া স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লীতে এবং বন্দী করে রাখা হয় লালকেল্লার সেল-এ। তার কোর্ট মার্শাল হয় এবং দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারও হয়। মুক্তি পান যখন তখন বয়স ৩০ বছর ১৯৪৬ সালে অর্থাৎ ৭৫ বছর আগে।

নেতাজীর মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে ডাক দেন "**দিল্লী চলো**", "Total Mobilisation", "টোটাল sacrifice", আজাদ হিন্দ ফৌজে সব হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের একটাই পরিচয় **আমরা এক ভারতবাসী**। একটাই শ্লোগান "**জয় হিন্দ**"। ফ্রন্ট লাইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও নেতাজীর সঙ্গে পরমর্শ এই সবের সৌভাগ্যের চিহ্ন যেন তিনি নিঃশব্দে বহন করে পানিহাটিকে গৌরমণ্ডিত করেছেন। ওঁর স্মৃতিকথার কিছু অংশ আমাদের আই এন এ ও নেতাজীর অতুলনীয় অবদানকে স্মরণ করায়। অবর্ণনীয় কষ্ট, অনাহার, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কাকে জয় করে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত পালনে সঙ্কল্পবদ্ধ এই মানুষগুলো জন্যই আমাদের স্বাধীনতা—যা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। বহু প্রতিকূল পরিবেশ, সামরিক সরঞ্জাম, খাদ্য ও রসদের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যরা অভূতপূর্ব শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছিল। তাই **লে. কর্ণেল বি. কে. নন্দীর** পানিহাটিতে আবাসভূমি হিসাবে আসা যেন সেই কোন কালচক্রের আভাস।

এই ইতিহাস আজ আক্ষরিক অর্থেই পাঠ্য বইয়ের নীরস পাতায় বন্দি। আজকের প্রজন্মের ভারতীয়দের কাছে সুভাষচন্দ্র মিথ আর আই এন এ-ও এক ধূসর কিংবদন্তি।